বঙ্কুবাবুর বন্ধু

বঙ্কুবাবুকে কেউ কোনদিন রাগতে দেখে নি। সত্যি বলতে কি, তিনি রাগলে যে কী রকম ব্যাপারটা হবে, কী যে বলবেন বা করবেন তিনি, সেটা আন্দাজ করা ভারি শক্ত।

অথচ রাগবার যে কারণ ঘটে না তা মোটেই নয়। আজ বাইশ বছর তিনি কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি ইস্কুলে ভূগোল ও বাংলা পড়িয়ে আসছেন ; এর মধ্যে কত ছাত্র এল গেল, কিন্তু বঙ্কুবাবুর পিছনে লাগা—ব্ল্যাকবোর্ডে তাঁর ছবি আঁকা, তাঁর বসবার চেয়ারে গাবের আঠা মাখিয়ে রাখা, কালীপুজোর রাত্রে তাঁর পিছনে ছুঁচোবাজি ছেড়ে দেওয়া—এসবই এই বাইশ বছর ধরে ছাত্র-পরম্পরায় চলে আসছে।

বঙ্কুবাবু কিন্তু কক্ষনো রাগেন নি। কেবল মাঝে মাঝে গলা খাঁকরিয়ে বলেছেন—ছিঃ !

এর একটা কারণ অবিশ্যি এই যে তিনি যদি রাগটাগ করে মাস্টারি ছেড়ে দেন তো তাঁর মত গরিব লোকের পক্ষে এই বয়সে আর-একটা মাস্টারি বা চাকরি খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত হবে। আর-একটা কারণ হল, ক্লাসভর্তি দুষ্টু ছেলের মধ্যে দু-একটা করে ভালো ছাত্র প্রতিবারেই থাকে ; বঙ্কুবাবু তাদের সঙ্গে ভাব করে তাদের পড়িয়ে এত আনন্দ পান যে তাতেই তাঁর মাস্টারি সার্থক হয়ে যায়। এই সব ছাত্রদের তিনি কখনো কখনো নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। তারপর বাটি করে মুড়কি খেতে দিয়ে গল্পচ্ছলে দেশবিদেশের আশ্চর্য ঘটনা শোনান। আফ্রিকার গল্প, মেরু আবিষ্কারের গল্প, ব্রেজিলের মানুষখেকো মাছের গল্প, সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়া আটলান্টিস মহাদেশের গল্প, এসবই বঙ্কুবাবু চমৎকার করে বলতে পারেন।

শনি-রবিবার সন্ধ্যাবেলাটা বঙ্কুবাবু যান গ্রামের উকিল শ্রীপতি মজুমদারের আড্ডায়। অনেকবার ভেবেছেন আর যাবেন না, এই শেষবার, আর না। কারণ ছাত্রদের টিটকিরি গা-সওয়া হয়ে গেলেও, বুড়োদের পিছনে লাগাটা যেন কিছুতেই বরদাস্ত হয় না। এই বৈঠকে তাঁকে নিয়ে যে ধরনের ঠাট্টা-তামাশা চলে সেটা সত্যিই মাঝে মাঝে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

এই তো সেদিন, দু' মাসও হয় নি, ভূতের কথা হচ্ছিল। বঙ্কুবাবু সচরাচর মুখ খোলেন না। সেদিন কী জানি হল, হঠাৎ বলে ফেললেন যে তাঁর ভূতের ভয় নেই। আর যায় কোথা ! এমন সুযোগ কি এসব লোকে ছাড়ে ? রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে বঙ্কুবাবুকে যাচ্ছেতাইভাবে নাজেহাল হতে হল। মিত্তিরদের তেঁতুলগাছটার তলায় কে এক লিকলিকে লম্বা লোক ভুশোটুশো মেখে অন্ধকারে তাঁর পিঠের উপর পড়ল ঝাঁপিয়ে। এই আড্ডারই কারো চক্রান্ত আর কি।

ভয় অবিশ্যি পান নি বঙ্কুবাবু। তবে চোট লেগেছিল। তিনদিন ঘাড়ে ব্যথা ছিল। আর সবচেয়ে যেটা বিশ্রী—তাঁর নতুন পাঞ্জাবীটা কালিটালি লেগে ছিঁড়েটিড়ে একাকার

হয়ে গিয়েছিল। ঠাট্টার এ কী রকম রে বাপু!

এ ছাড়া ছোটখাটো পিছনে লাগার ব্যাপার তো লেগেই আছে। এই যেমন ছাতাটা জুতোটা লুকিয়ে রাখা, পানে আসল মসলার বদলে মাটির মসলা দিয়ে দেওয়া, জোর করে ধরে-বেঁধে গান গাওয়ানো ইত্যাদি।

কিন্তু তাও আড্ডায় আসতে হয়। না এলে শ্রীপতিবাবু কী ভাববেন। একে তো তিনি গাঁয়ের গণ্যমান্য লোক, দিনকে রাত করতে পারেন এমন ক্ষমতা তাঁর, তার উপরে আবার তাঁর বঙ্কুবাবু না হলে চলেই না। তিনি বলেন, একজন লোক থাকবে যাকে নিয়ে বেশ রসিয়ে রগড় করা চলবে, নইলে আর আড্ডা! ডাকো বঙ্কুবিহারীকে।

আজকের আড্ডার সুর ছিল উচ্চগ্রামের ; অর্থাৎ স্যাটিলাইট নিয়ে কথা হচ্ছিল। আজই সন্ধ্যায় সূর্য ডোবার কিছুক্ষণ পরেই উত্তর দিকের আকাশে একটি চলন্ত আলো দেখা গেছে। মাস তিনেক আগেও একবার ওই রকম আলো দেখা গিয়েছিল এবং তাই নিয়ে আড্ডায় বিস্তর গবেষণা চলেছিল। পরে জানা যায় ওটা একটা রাশিয়ান স্যাটিলাইট। খটকা না ফোসকা এই গোছের কী একটা নাম। সেটা নাকি ৪০০ মাইল ওপর দিয়ে বনবন করে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, এবং তার থেকে নাকি বৈজ্ঞানিকেরা অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছেন।

আজকের আলোটা বঙ্কুবাবু প্রথম দেখেছিলেন। তারপর তিনিই সেটা নিধু মোক্তারকে ডেকে দেখান।

কিন্তু আড্ডায় এসে বঙ্কুবাবু দেখলেন যে নিধুবাবু অম্লানবদনে প্রথম দেখার ক্রেডিটটা নিজেই নিয়েছেন, এবং সেই নিয়ে খুব বড়াই করছেন। বঙ্কুবাবু কিচ্ছু বললেন না।

স্যাটিলাইট সম্বন্ধে এখানে কেউই বিশেষ কিছু জানেন না, তবে এসব কথা বলতে তো আর টিকিট লাগে না, বা বললে পুলিসেও ধরে না, তাই সবাই ফোড়ন দিচ্ছেন।

চণ্ডীবাবু বললেন, 'যাই বল বাপু, এসব স্যাটিলাইট-ফ্যাটিলাইট নিয়ে খামাখা মাথা ঘামানো আমাদের শোভা পায় না। আমাদের কাছে ও-ও যা, সাপের মাথার মণিও তাই। কোথায় আকাশের কোন্ কোণে আলোর ফুটকি দেখছ, তাই নিয়ে খবরের কাগজে লিখছে, আর তাই পড়ে তুমি বৈঠকখানায় বসে পান চিবুতে চিবুতে বাহবা দিচ্ছ। যেন তোমারই কীর্তি, তোমারই গৌরব। হাততালিটা যেন তোমারই পাওনা। হুঁ।'

রামকানাই-এর বয়সটা কম। সে বলল, 'আমার না হোক, মানুষের তো। সবার উপরে মানুষ সত্য।'

চণ্ডীবাবু বললেন, 'রাখো রাখো। যত সব...মানুষ না তো কি বাঁদরে বানাবে স্যাটিলাইট? মানুষ ছাড়া আর আছে কী?'

নিধু মোক্তার বললেন, 'আচ্ছা বেশ। স্যাটিলাইটের কথা ছেড়েই দিলাম। তাতে না-হয় লোকটোক নেই, কেবল একটা যন্তর পাক খাচ্ছে। তা সে তো লাট্টুও পাক খায়। সুইচ টিপলে পাখাও ঘোরে। যাকগে। কিন্তু রকেট? রকেটের ব্যাপারটা তো নেহাত ফেলনা নয় ভায়া।'

চণ্ডীবাবু নাক সিঁটকে বললেন, 'রকেট। রকেট ধুয়ে কোন্ জলটা খাবে শুনি?

রকেট ! তাও বুঝতাম যদি হ্যাঁ, এই আমাদের দেশেই তৈরি হল, গড়ের মাঠ থেকে ছাড়লে সেটা চাঁদে-টাদে তাগ করে, আমরা গিয়ে টিকিট কিনে দেখে এলুম, তাও একটা মানে হয়।'

রামকানাই বলল, 'ঠিক বলেছেন। আমাদের কাছে রকেটও যা, ঘোড়ার ডিমও তাই।'

ভৈরব চক্কোত্তি বললেন, 'ধর যদি অন্য গ্রহ-টহ থেকে একটা কিছু পৃথিবীতে এল...'

'এলেই বা কী ? তুমি-আমি তো আর সেটাকে দেখতে পাব না।'

'তা বটে।'

আড্ডার সবাই চায়ের পেয়ালায় মুখ দিলেন। এর পর তো আর কথা চলে না !

এই অবসরে বঙ্কুবাবু খুক করে একটু কেশে নিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'ধরুন যদি এইখানেই আসে।'

নিধুবাবু অবাক হবার ভান করে বললেন, 'ব্যাঁকা আবার কী বলছে হে, অ্যাঁ ? কে আসবে এইখানে ? কোত্থেকে আসবে ?'

বঙ্কুবাবু আবার মৃদুস্বরে বললেন, 'অন্য গ্রহ থেকে কোন লোক-টোক...'

ভৈরব চক্কোত্তি তাঁর অভ্যাসমত বঙ্কুবাবুর পিঠে একটা অভদ্র চাপড় মেরে দাঁত বার করে বললেন, 'বাঃ বঙ্কুবিহারী বাঃ। অন্য গ্রহ থেকে লোক আসবে এইখানে ? এই গণ্ডগ্রামে ? লন্ডন নয়, মস্কো নয়, নিউইয়র্ক নয়, মায় কলকেতাও নয়— একেবারে এই কাঁকুড়গাছি ? তোমার তো শখ কম নয় !'

বঙ্কুবাবু চুপ করে গেলেন। কিন্তু তাঁর মন বলতে লাগল, সেটা আর এমন অসম্ভব কী ? বাইরে থেকে যারা আসবে, তাদের তো পৃথিবীতে আসা নিয়ে কথা। অত যদি হিসেব করে না-ই আসে ? কাঁকুড়গাছিতে না-আসা যেমন সম্ভব আসাও তো ঠিক তেমনি সম্ভব।

শ্রীপতিবাবু এতক্ষণ কিচ্ছু বলেন নি। এবার তিনি নড়েচড়ে বসতেই সকলে তাঁর মুখের দিকে চাইল। তিনি চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বিজ্ঞের মত ভারী গলায় বললেন, 'দেখ, বাইরের গ্রহ থেকে যদি লোক আসেই, তবে এটা জেনে রেখো যে তারা এই পোড়া দেশে আসবে না। তাদের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই ! আর অত বোকা তারা নয়। আমার বিশ্বাস তারা সাহেব, এবং এসে নামবে ওই সাহেবদেরই দেশে, পশ্চিমে। বুঝেছ ?'

এ কথায় এক বঙ্কুবাবু ছাড়া সকলেই একবাক্যে সায় দিলেন।

চণ্ডীবাবু নিধু মোক্তারের কোমরে খোঁচা মেরে ইশারায় বঙ্কুবাবুকে দেখিয়ে ন্যাকা-ন্যাকা গলায় বললেন, 'আমার কিন্তু বাবা মনে হয় যে বঙ্কু ঠিকই বলেছে। বঙ্কুবিহারীর মত লোক যেখানে আছে সেখানে আসাই তো তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কী বল হে নিধু ? ধর যদি একটা স্পেসিমেন নিয়ে যেতে হয়, তাহলে বঙ্কুর মত দ্বিতীয় মানুষ কোথায় পাচ্ছে শুনি ?'

নিধু মোক্তার সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক ঠিক। বুদ্ধি বল, চেহারা বল, যাই বল, ব্যাঁকা একেবারে আইডিয়াল।'

রামকানাই বলল, 'একেবারে জাদুঘরে রাখার মত। কিংবা চিড়িয়াখানায়।'

বঙ্কুবাবু মনে মনে বললেন, স্পেসিমেন যদি বলতে হয় তো এঁরাই বা কী কম ? ওই

তো শ্রীপতিবাবু—উটের মত থুতনি। আর ওই ভৈরব চক্কোত্তি—কচ্ছপের মত চোখ, ওই নিধু মোক্তার ছুঁচো, রামকানাই ছাগল, চণ্ডীবাবু—চামচিকে। চিড়িয়াখানায় যদি রাখতে হয় তো...

বঙ্কুবাবুর চোখে জল এল। তিনি উঠে পড়লেন। আজ অন্তত আড্ডাটা ভাল লাগবে ভেবেছিলেন। হল না। মনটা ভারী হয়ে গেছে। আর থাকা চলে না।

'সে কী, উঠলে না কি হে?' শ্রীপতিবাবু যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'হ্যাঁ, রাত হল।'

'কই রাত? কাল তো ছুটি! বোসো, চা খাও।'

'নাঃ। আজ আসি। পরীক্ষার খাতা আছে কিছু। নমস্কার।'

রামকানাই বলল, 'দেখবেন বঙ্কুদা। আজ আবার অমাবস্যা। মঙ্গলবার। মানুষ কিন্তু ভূতেরও বাড়া।'

বঙ্কুবাবু আলোটা দেখতে পেলেন পঞ্চা ঘোষের বাঁশবাগানের মাঝবরাবর এসে। তাঁর নিজের হাতে আলো ছিল না। শীতকাল, তাই সাপের ভয় নেই; তাছাড়া পথও খুব ভালো ভাবেই চেনা। এ পথে এমনিতে বড় একটা কেউ আসে না, কিন্তু বঙ্কুবাবুর শর্টকাট হয় বলেই তিনি এই পথে যান।

কিছুক্ষণ থেকেই তাঁর কেমন জানি খটকা লাগছিল। অন্যদিনের চেয়ে কী-জানি একটা অন্য রকম ভাব। কিন্তু সেটা যে কী তা বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ খেয়াল হল যে বাঁশবনে আজ ঝিঁঝি ডাকছে না। একদম না। সেইটেই তফাত। অন্যদিন যতই বনের ভিতর ঢোকেন ততই ঝিঁঝির ডাক বাড়ে। আজ ঠিক তার উল্টো। তাই এমন থমথমে ভাব। ব্যাপার কী? ঝিঁঝিগুলো সব ঘুমোচ্ছে নাকি?

ভাবতে ভাবতে হাত বিশেক গিয়ে পুব দিকে চোখ যেতেই আলোটা দেখতে পেলেন।

প্রথমে মনে হল বুঝি আগুন লেগেছে। বনের মধ্যিখানের ফাঁকটায় যেখানে ডোবাটা রয়েছে তার চারপাশের বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে গাছের ডালে ও পাতায় একটা গোলাপী আভা। আর নিচে, ডোবার সমস্ত জায়গাটা জুড়ে উজ্জ্বল গোলাপী আলো। কিন্তু আগুন নয়, কারণ আলোটা স্থির।

বঙ্কুবাবু এগোতে লাগলেন।

কানের মধ্যে একটা শব্দ আসছে। কিন্তু সেটা যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। হঠাৎ কানে তালা লাগলে যেমন শব্দ হয়—রী রী রী রী রী—এ যেন ঠিক সেই রকম।

বঙ্কুবাবুর গা একটু ছমছম করে থাকলেও, একটা অদম্য কৌতূহলবশে তিনি এগিয়ে চললেন।

ডোবার থেকে ত্রিশ হাত দূরে বড় বাঁশঝাড়টা পেরোতেই তিনি জিনিসটা দেখতে পেলেন। একটা অতিকায় উপুড়-করা কাঁচের বাটির মত জিনিস সমস্ত ডোবাটাকে আচ্ছাদন করে পড়ে আছে এবং তার প্রায়-স্বচ্ছ ছাউনির ভিতর থেকে একটা তীব্র অথচ স্নিগ্ধ গোলাপী আলো বিচ্ছুরিত হয়ে চতুর্দিকের বনকে আলো করে দিয়েছে।

এমন অদ্ভুত দৃশ্য বঙ্কুবাবু স্বপ্নেও কখনো দেখেন নি।

অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বঙ্কুবাবু লক্ষ করলেন যে জিনিসটা স্থির হলেও যেন নির্জীব নয়। অল্প অল্প স্পন্দনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নিশ্বাসপ্রশ্বাসে মানুষের বুক যেমন ওঠে নামে, কাঁচের ঢিবিটা তেমনি উঠছে নামছে।

বঙ্কুবাবু ভালো করে দেখবার জন্য আর হাত চারেক এগিয়ে যেতেই হঠাৎ যেন তাঁর শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। আর তার পরমুহূর্তেই তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর হাত-পা যেন কোন অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলা হয়েছে। তাঁর শরীরে আর শক্তি নেই। তিনি না পারেন এগোতে, না পারেন পিছোতে।

কিছুক্ষণ এইভাবে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বঙ্কুবাবু দেখলেন যে জিনিসটার স্পন্দন আস্তে আস্তে থেমে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল সেই অদ্ভুত কানে-তালা-লাগার শব্দটা। তারপর হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে, কতকটা মানুষের মত কিন্তু অত্যন্ত মিহি গলায় চীৎকার এল— মিলিপিপ্পিং খ্লুক, মিলিপিপ্পিং খ্লুক!

বঙ্কুবাবু চমকে গিয়ে থ। এ আবার কী ভাষা রে বাবা! আর যে বলছে সেই বা কোথায়?

দ্বিতীয় চীৎকার শুনে বঙ্কুবাবুর বুকটা ধড়াস করে উঠল।

'হু আর ইউ? হু আর ইউ?'

এ যে ইংরিজি! হয়তো তাঁকেই জিজ্ঞেস করা হচ্ছে প্রশ্নটা।

বঙ্কুবাবু ঢোক গিলে বলে উঠলেন, 'আই অ্যাম বঙ্কুবিহারী দত্ত স্যার— বঙ্কুবিহারী দত্ত।'

প্রশ্ন এল, 'আর ইউ ইংলিশ? আর ইউ ইংলিশ?'

বঙ্কুবাবু চেঁচিয়ে বললেন, 'নো স্যার। বেঙ্গলি কায়স্থ স্যার।'

একটুক্ষণ চুপচাপের পর পরিষ্কার উচ্চারণে কথা এল, 'নমস্কার।'

বঙ্কুবাবু হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'নমস্কার।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ করলেন যে, তাঁর হাত-পায়ের অদৃশ্য বাঁধনগুলো যেন আপনা থেকেই আলগা হয়ে গেল। তিনি ইচ্ছা করলেই পালাতে পারেন, কিন্তু পালালেন না। কারণ তিনি দেখলেন, সেই অতিকায় কাঁচের ঢিবির একটা অংশ আস্তে আস্তে দরজার মত খুলে যাচ্ছে।

সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল প্রথমে একটা মসৃণ বলের মত মাথা, তারপর একটা অদ্ভুত প্রাণীর সমস্ত শরীরটা।

লিকলিকে শরীরের মাথা বাদে সমস্তটাই একটা চকচকে গোলাপী পোশাকে ঢাকা। মুখের মধ্যে কান ও নাকের জায়গায় দুটো করে এবং ঠোঁটের জায়গায় একটা ফুটো। লোম বা চুলের লেশমাত্র নেই। হলদে গোলগোল চোখদুটো এমনই উজ্জ্বল যে দেখলে মনে হয় আলো জ্বলছে।

লোকটা আস্তে আস্তে বঙ্কুবাবুর দিকে এগিয়ে এসে তাঁর তিন হাত দূরে থেকে তাঁকে একদৃষ্টে দেখতে লাগল। বঙ্কুবাবুর হাতদুটো আপনা থেকেই জোড় হয়ে এল।

প্রায় এক মিনিট দেখার পর লোকটা সেই রকম বাঁশির মত মিহি গলায় বলল, 'তুমি মানুষ?'

বঙ্কুবাবু বললেন, 'হুঁ।'

লোকটা বলল, 'এটা পৃথিবী ?'

বঙ্কুবাবু বললেন, 'হুঁ।'

'ঠিক ধরেছি—যন্ত্রপাতিগুলো গোলমাল করছে। যাবার কথা ছিল প্লুটোয়। একটা সন্দেহ ছিল মনে, তাই তোমাকে প্রথমে প্লুটোর ভাষায় প্রশ্ন করলাম। যখন দেখলাম তুমি উত্তর দিলে না তখন বুঝতে পারলাম যে পৃথিবীতেই এসে পড়েছি। পণ্ডশ্রম হল। ছি-ছি-ছি, এতদূরে এসে! আরেকবার এরকম হয়েছিল। বুধ যেতে বৃহস্পতি গিয়ে পড়েছিলাম। একদিনের তফাত আর কি, হেঃ হেঃ হেঃ।'

বঙ্কুবাবু কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। তাছাড়া ওঁর এমনিতেই অসোয়াস্তি লাগছিল। কারণ লোকটা সরু সরু আঙুল দিয়ে ওঁর হাত-পা টিপে টিপে দেখতে আরম্ভ করেছে।

টেপা শেষ করে লোকটা বলল, 'আমি ক্রেনিয়াস গ্রহের অ্যাং। মানুষের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের প্রাণী।'

এই লিকলিকে চার ফুট লোকটা মানুষের চেয়ে উচ্চস্তরের প্রাণী ? বললেই হল ? বঙ্কুবাবুর হাসি পেল।

লোকটা কিন্তু আশ্চর্যভাবে বঙ্কুবাবুর মনের কথা বুঝে ফেলল। সে বলল, 'অবিশ্বাস করার কিছু নেই! প্রমাণ আছে। ...তুমি ক'টা ভাষা জান ?'

বঙ্কুবাবু মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'বাংলা, ইংরিজি, আর ইয়ে...হিন্দিটা...মানে...'

'মানে আড়াইটে।'

'হ্যাঁ...'

'আমি জানি চোদ্দ হাজার। তোমাদের সৌরজগতে এমন ভাষা নেই যা আমি জানি না। তাছাড়া আরো একত্রিশটি বাইরের গ্রহের ভাষা আমার জানা আছে। এর পঁচিশটি গ্রহে আমি নিজে গিয়েছি। তোমার বয়স কত ?'

'পঞ্চাশ।'

'আমার আটশ তেত্রিশ। তুমি জানোয়ার খাও ?'

বঙ্কুবাবু এই সেদিন কালীপুজোয় পাঁঠার মাংস খেয়েছেন—না বলেন কী করে।

অ্যাং বলল, 'আমরা খাই না। বেশ কয়েকশ' বছর হল ছেড়ে দিয়েছি। আগে খেতাম। হয়তো তোমাকেও খেতাম।'

বঙ্কুবাবু ঢোক গিললেন।

'এই জিনিসটা দেখছ ?'

অ্যাং একটা নুড়িপাথরের মত ছোট জিনিস বঙ্কুবাবুর হাতে দিল। সেটা হাতে ঠেকতেই বঙ্কুবাবুর সর্বাঙ্গে আবার এমন একটা শিহরণ খেলে গেল যে তিনি তৎক্ষণাৎ ভয়ে পাথরটা ফেরত দিয়ে দিলেন।

অ্যাং হেসে বলল, 'এটা আমার হাতে ছিল বলে তুমি তখন এগোতে পার নি। কেউ পারে না। শত্রুকে জখম না করে অক্ষম করার মত এমন জিনিস আর নেই।'

বঙ্কুবাবু এবার সত্যিই অবাক হতে শুরু করেছেন।

অ্যাং বলল, 'এমন কোন জায়গা বা দৃশ্য আছে যা তোমার দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু হয়ে ওঠে না ?'

বঙ্কুবাবু ভাবলেন, সারা পৃথিবীটাই তো দেখা বাকি। ভূগোল পড়ান, অথচ

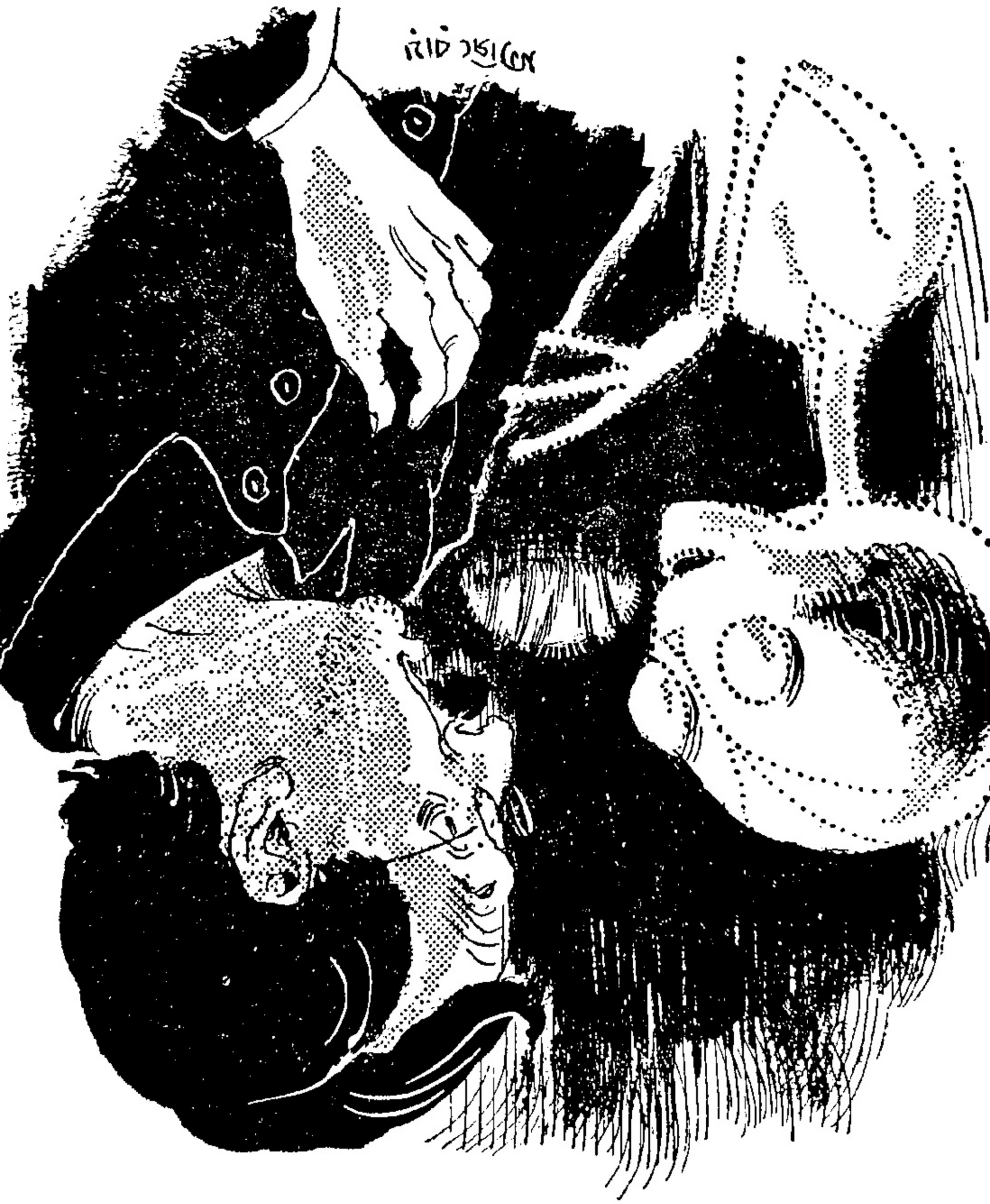

বাংলাদেশের গুটিকতক গ্রাম ও শহর ছাড়া আর কী দেখেছেন তিনি ? বাংলাদেশেরই বা কী দেখেছেন ? হিমালয়ের বরফ দেখেন নি, দীঘার সমুদ্র দেখেন নি, সুন্দরবনের জঙ্গল দেখেন নি, এমনকি শিবপুরের বাগানের সেই বটগাছটা পর্যন্ত দেখেন নি।

মুখে বললেন, 'অনেক কিছুই তো দেখি নি। ধরুন গরম দেশের মানুষ, তাই নর্থ পোলটা দেখতে খুব ইচ্ছে করে।'

অ্যাং একটা ছোট কাঁচ-লাগানো নল বার করে বঙ্কুবাবুর মুখের সামনে ধরে বলল, 'এইটেয় চোখ লাগাও।'

চোখ লাগাতেই বঙ্কুবাবুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এও কী সম্ভব ? তাঁর চোখের সামনে ধূ ধূ করছে অন্তহীন বরফের মরুভূমি, তার মাঝে মাঝে মাথা উঁচিয়ে আছে পাহাড়ের মত এক-একটা বরফের চাঁই। উপরে গাঢ় নীল আকাশে রামধনুর রঙে রঙীন বিচিত্র নকশা সব ক্ষণে ক্ষণে রূপ পালটাচ্ছে— অরোরা বোরিয়ালিস। ওটা কী ? ইগলু ! ওই পোলার বেয়ারের সারি। ওই পেঙ্গুইনের দল। ওটা কোন্ বীভৎস জানোয়ার ? ভালো করে দেখে বঙ্কুবাবু চিনলেন— সিন্ধুঘোটক। একটা নয়, দুটো— প্রচণ্ড লড়াই চলেছে। মুলোর মত জোড়া দাঁত একটা আর-একটার গায়ে বসিয়ে দিল। শুভ্র বরফের গায়ে লাল রক্তের স্রোত !...

পৌষ মাসের শীতে বরফের দৃশ্য দেখে বঙ্কুবাবুর ঘাম ঝরতে শুরু করল।

অ্যাং বলল, 'ব্রেজিলে যেতে ইচ্ছে করে না ?'

বঙ্কুবাবুর মনে পড়ে গেল—সেই মাংসখেকো পিরান্হা মাছ। আশ্চর্য। লোকটা তাঁর মনের কথা টের পায় কী করে ?

বঙ্কুবাবু আবার চোখ লাগালেন।

গভীর জঙ্গল। দুর্ভেদ্য অন্ধকারে লতাপাতার ফাঁক দিয়ে গলে আসা ইতস্তত রোদের ছিটেফোঁটা, একপাশে একটা প্রকাণ্ড গাছ, তা থেকে ঝুলছে ওটা কী ? সর্বনাশ ! এত বড় সাপ বঙ্কুবাবু জীবনে কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল কোথায় যেন পড়েছেন ব্রেজিলের অ্যানাকণ্ডা। অজগরের বাবা। কিন্তু মাছ কই ? ওই যে একটা খাল। দু'পাশে ডাঙায় কুমির রোদ পোয়াচ্ছে। সার সার কুমির— তার একটা নড়ে ওঠে। জলে নামবে। ওই নেমে গেল সড়াত—বঙ্কুবাবু যেন শব্দটাও শুনতে পেলেন। কিন্তু এ কী ব্যাপার ? কুমিরটা এমন বিদ্যুদ্বেগে জল ছেড়ে উঠে এল ! কেন ? কিন্তু এ কি সেই একই কুমির ? বঙ্কুবাবু বিস্ফারিত চোখে দেখলেন যে কুমিরটার তলার অংশটায় মাংস বলে প্রায় কিছুই নেই, খালি হাড়। আর শরীরের বাকী অংশটা গোগ্রাসে গিলে চলেছে পাঁচটি দাঁতালো রাক্ষুসে মাছ। পিরান্হা মাছ।

বঙ্কুবাবু আর দেখতে পারলেন না। তাঁর হাত-পা কাঁপছে, মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।

অ্যাং বলল, 'এখন বিশ্বাস হয় আমরা শ্রেষ্ঠ ?'

বঙ্কুবাবু জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন, 'তা তো বটেই। নিশ্চয়ই। বিলক্ষণ। একশোবার।'

অ্যাং বলল, 'বেশ। তোমায় দেখে এবং তোমার হাত-পা টিপে মনে হচ্ছে যে তুমি নিকৃষ্ট প্রাণী হলেও, মানুষ হিসেবে খারাপ নও। তবে তোমার দোষ হচ্ছে যে তুমি অতিরিক্ত নিরীহ, তাই তুমি জীবনে উন্নতি কর নি। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা বা

নীরবে অপমান সহ্য করা এসব শুধু মানুষ কেন, কোন প্রাণীরই শোভা পায় না। যাক, তোমার সঙ্গে আলাপ হবার কথা ছিল না, হয়ে ভালোই লাগল। তবে পৃথিবীতে বেশি সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি বরং আসি।'

বঙ্কুবাবু বললেন, 'আসুন অ্যাংবাবু। আমিও আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব—'

বঙ্কুবাবুর কথা আর শেষ হল না, চক্ষের পলকে কখন যে অ্যাং রকেটে উঠে পড়ল এবং কখন যে সেই রকেট পঞ্চা ঘোষের বাঁশবন ছেড়ে উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল, তা যেন বঙ্কুবাবু টেরই পেলেন না। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল যে আবার ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করেছে। রাত হয়ে গেল অনেক।

বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে বঙ্কুবাবু তাঁর মনে একটা আশ্চর্য ভাব অনুভব করলেন। কত বড় একটা ঘটনা যে তাঁর জীবনে ঘটে গেল, এই কিছুক্ষণ আগেও তিনি সেটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি। কোথাকার কোন্ সৌরজগতের এক গ্রহ, তার নামও হয়তো কেউ শোনে নি, তারই একজন লোক—লোক তো নয়, অ্যাং—তাঁর সঙ্গে এসে আলাপ করে গেল। কী আশ্চর্য। কী অদ্ভুত। সারা পৃথিবীতে আর কারো সঙ্গে নয়, কেবল তাঁর সঙ্গে। তিনি, শ্রীবঙ্কুবিহারী দত্ত, কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি ইস্কুলে ভূগোল ও বাংলার শিক্ষক। আজ, এই এখন থেকে, অন্তত একটা অভিজ্ঞতায়, তিনি সারা পৃথিবীতে এক ও অদ্বিতীয়।

বঙ্কুবাবু দেখলেন, তিনি আর হাঁটছেন না, নাচছেন।

পরদিন রবিবার। শ্রীপতিবাবুর বাড়িতে জোর আড্ডা। কালকের আলোর খবরটা আজ কাগজে বেরিয়েছে, তবে নেহাতই নগণ্যের পর্যায়ে। বাংলাদেশের মাত্র দু-একটা জায়গা থেকে আলোটা দেখতে পাওয়ার খবর এসেছে। তাই সেটাকে ফ্লাইং সসার বা উড়ন্ত পিরিচের মত গুজবের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

আজ পঞ্চা ঘোষও আড্ডায় এসেছেন। তাঁর চল্লিশ বিঘের বাঁশবাগানের মধ্যে যে ডোবাটা আছে, তার চারপাশের দশটা বাঁশঝাড় নাকি রাতারাতি একেবারে নেড়া হয়ে গেছে। শীতকালে বাঁশের শুকনো পাতা ঝরে বটে, কিন্তু এইভাবে হঠাৎ নেড়া হয়ে যাওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক, এই বিষয়েই কথা হচ্ছিল, এমন সময় ভৈরব চক্কোত্তি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আজ বঙ্কুর দেরি কেন?'

তাই তো, এতক্ষণ কারো খেয়াল হয় নি।

নিধু মোক্তার বললেন, 'ব্যাঁকা কি আর সহজে এমুখো হবে? কাল মুখ খুলতে গিয়ে যা দাবড়ানি খেয়েছে।'

শ্রীপতিবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তা বললে চলবে কেন? বঙ্কুকে যে চাই। রামকানাই, তুমি একবার যাও তো দেখি ধরে নিয়ে আসতে পার কিনা।'

রামকানাই 'চা-টা খেয়েই যাচ্ছি' বলে সবে পেয়ালায় চুমুক দিতে গেছে এমন সময় বঙ্কুবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন।

ঢুকলেন বললে অবিশ্যি কিছুই বলা হল না। একটা ছোটখাটো বৈশাখী ঝড় যেন একটি বেঁটেখাটো মানুষের বেশে প্রবেশ করে সবাইকে থমথমিয়ে দিল।

তারপরে ঝড়ের খেলা। প্রথমে পুরো এক মিনিট ধরে বঙ্কুবাবু অট্টহাসি হাসলেন— যে হাসি এর আগে কেউ কোনদিন শোনে নি, তিনি নিজেও শোনেন নি।

তারপর হাসি থামিয়ে একটা প্রচণ্ড গলা-খাঁকরানি দিয়ে গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করলেন, "বন্ধুগণ ! আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আজ এই আড্ডায় আমার শেষদিন। আপনাদের দলটি ছাড়ার আগে আমি কয়েকটি কথা আপনাদের বলে যেতে চাই এবং তাই আজ এখানে আসা। এক নম্বর— সেটা সকলের সম্বন্ধেই খাটে— আপনারা সবাই বড্ড বাজে বকেন। যে বিষয়ে জানেন না, সে বিষয়ে বেশি কথা বললে লোকে বোকা বলে। দুই নম্বর— এটা চণ্ডীবাবুকে বলছি— আপনাদের বয়সে পরের ছাতা-জুতো লুকিয়ে রাখা শুধু অন্যায় নয়, ছেলেমানুষি। দয়া করে আমার ছাতাটা ও খয়েরি ক্যাম্বিসের জুতোটা কালকের মধ্যে আমার বাড়িতে পৌঁছে দেবেন। নিধুবাবু, আপনি যদি আমাকে ব্যাঁকা বলে ডাকেন তবে আমি আপনাকে ছ্যাঁদা বলে ডাকব, আপনাকে সেইটেই মেনে নিতে হবে। আর শ্রীপতিবাবু— আপনি গণ্যমান্য লোক, আপনার মোসাহেবের প্রয়োজন হবে বইকি। কিন্তু জেনে রাখুন যে আজ থেকে আমি আর ও-দলে নেই ; যদি বলেন তো আমার পোষা হুলোটাকে পাঠিয়ে দিতে পারি— ভালো পা চাটতে পারে।...ওহো, পঞ্চাবাবুও এসেছেন দেখছি— আপনাকেও খবরটা দিয়ে রাখি—কাল রাত্রে ক্রেনিয়াস গ্রহ থেকে একটি অ্যাং এসে আপনার বাঁশবাগানের ডোবাটির মধ্যে নেমেছিল। আমার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। লোকটি—থুড়ি, অ্যাংটি—ভারি ভালো।"

এই বলে বঙ্কুবাবু তাঁর বাঁ হাত দিয়ে ভৈরব চক্কোত্তির পিঠে একটা চাপড় মেরে বিষম খাইয়ে সদর্পে শ্রীপতিবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই রামকানাই-এর হাত থেকে চা-ভর্তি পেয়ালাটা পড়ে গিয়ে সব্বাই-এর কাপড়ে-চোপড়ে গরম চা ছিটিয়ে চুরমার হয়ে গেল।